প্রবন্ধ

শ্রীমা ও নারীজাগরণ

স্বামী নিরন্তরানন্দ

ভূমিকা

'নারীবাদ', 'নারীপ্রগতি', 'নারীমুক্তি' প্রভৃতি শব্দগুলি বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রতীচ্যে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ভারতে এই শব্দগুলি বা তাদের অর্থসমূহের সঙ্গে যে-পরিমাণে বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচনা, সমালোচনা হয়েছে—তার তুলনায় সাধারণ নারীসমাজের ওপর এই ভাবগুলির প্রভাব খুবই সামান্য। আবার অজ্ঞান-অন্ধকার এত বেশি যে, নারীর সেই সামান্য উন্নতি বা জাগরণ আলেয়ার মতো দৃশ্যের পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে পড়ে। এর অন্যতম প্রধান কারণ, প্রথম প্রয়োজন ছিল নারীদের মধ্যে জাগরণ। নারী ভাবছেন, নারীপ্রগতি বা নারীমুক্তির প্রচেষ্টা তাঁর ওপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; আর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া জিনিস, শুভ হোক বা অশুভ হোক, তা কখনোই মানুষের উপকারী হয় না, স্থায়ীও হয় না। আবার সেই জাগরণ বিদেশীয় ভাবে পরিপুষ্ট। তাই সকল ভারতীয় সমাদরে তা গ্রহণ করতে পারছেন না। আধুনিক যুগে নারীজাগরণের মূল উৎস পশ্চিম দুনিয়া। পাশ্চাত্য নারীদের অবদান এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি অস্তিবাদী দার্শনিক সিমোনি দ্যঁ বঁ্যভার তাঁর গ্রন্থে নারীজাগরণের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখলেন ও বললেন: "নারী হয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করেন না" এবং "নারীমুক্তি বস্তুত নরেরেই মুক্তি।" দাবি করা হয়েছে, এই গ্রন্থ নারীবাদের অগ্রগতিতে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।[১] এপ্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি, রাষ্ট্রসংঘ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দকে 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' ঘোষণা করেছিলেন।

পশ্চিমের বাদ-প্রতিবাদের ঝড়ের প্রভাব ভারতে পড়বে, তা তো স্বাভাবিক। কিন্তু তার অনেক আগে ভারতের নবজাগরণের জনক রামমোহন রায় সতীদাহরূপ কুপ্রথা থেকে নারীকে মুক্ত করেছিলেন। তাঁর উত্তরসূরি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বিধবাবিবাহ প্রচলনে আইন প্রণয়নে সমর্থ হয়েছিলেন। নারীশিক্ষা প্রসারেও তিনি বহু অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও প্রশ্ন ওঠে, আজও নারী কী নরের পাশে উন্নতশির হয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন? মনে হয়, না। পণপ্রথা, নারীভ্রূণহত্যা, লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শিকার হওয়া বা আমোদপ্রিয় বিলাসী পুরুষের উপকরণ হওয়ার চাপে নারীর শির অদ্যাপি অবনত। এবিষয়টি শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের আলোকে দেখা যেতে পারে। সারদাদেবীর জীবন নিজ স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত, তাতেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে দেখি, নারী নরের পত্নীমাত্র নন, দেবীরূপে সুপূজিতা। তাই এযুগে তাঁর স্ত্রীগুরুগ্রহণ, স্ত্রীভাবসাধন ও মাতৃভাবের প্রসার। তেমনি, স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন: "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।" নর ও নারী মানবজাতিরূপ পক্ষীর দুই পক্ষবিশেষ। একের উন্নতি অপরের উন্নতির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু কেন? কারণ, "(নারী অনন্ত শক্তির আধার) শক্তি বিনা জগতের মুক্তি নাই। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে।" সাধারণ মানুষ এক জীবন্ত মানবীর দেহে মহাশক্তির বিকাশ দেখার সুযোগ পেলেন শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে। "মা-ঠাকুরানি ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"

এখন প্রশ্ন এই যে, 'জাগরণ' বলতে কী বোঝায়? বুঝতে পারি, এটি একটি রূপক শব্দ। 'জাগরণ' সাক্ষাৎভাবে বোঝায় ঘুম থেকে ওঠা বা জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসা; অজ্ঞান ও সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে, সত্যের প্রতি সচেতন হওয়া। সূর্যালোক বা কোন আলোকের প্রয়োজন হয় নিদ্রা থেকে ব্যুত্থিত হওয়ার জন্য। এখানে শ্রীমায়ের জীবন এক বিরাট আলোকস্তম্ভ। তাঁর আলোতেই নারী আত্মসচেতন হতে পারেন এবং নতুন জীবনদর্শনের সন্ধান মেলে শ্রীমায়ের জীবন অনুধ্যানে। তিনি একাধারে গৃহিণী, পত্নী ও জননী—এসকলের প্রত্যেকটির বর্তমান যুগোপযোগী আদর্শ রূপ। তাঁর জীবন থেকে নারী জানতে পারেন যে, পরাশ্রয়ী ভাব নারীর দুর্বলতা। নারীর স্বমর্যাদা নিজের পবিত্রতায় নিহিত এবং সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য জীবনে নারীর প্রবেশাধিকার আছে—এগুলি বর্তমান যুগের প্রতি শ্রীমায়ের নতুন উপহার। শ্রীরামকৃষ্ণও শ্রীমায়ের এই জ্ঞানদায়িনী রূপের কথা বলেছেন: "ও সারদা-সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।" "জ্ঞানদায়িনী

শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র করে যথার্থ নারীজাগরণ সম্ভবপর। তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে একালের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক লিখেছেন: "সারদাদেবীর মধ্যে সত্যিই আছে আধুনিক উৎকেন্দ্রিকতার মধ্যে স্থিরত্বে আশ্বাস, যুগযন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণের উপায়, যন্ত্রণাবর্তের মধ্যে শান্তিনিকেতন।" বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে অবস্থিত ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আচার্য বর্তমান লেখক শ্রীমায়ের জীবনের অবিচল ঔদার্য, প্রত্যয়ী সত্যনিষ্ঠা ও করুণার ব্যঞ্জনায় যে-প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেছেন তা ভক্তজনের আনন্দজীবনে অমৃতের স্বাদ বহন করে আনবে, সন্দেহ নেই।—**সম্পাদক**

মহাবুদ্ধিমতী"। শ্রীমা সেই জ্ঞান গ্রন্থরচনা বা বক্তৃতামালার মধ্য দিয়ে দেননি, তিনি নিজ জীবনে সেই জ্ঞানের ফলিত বা প্রদর্শিত রূপে (practical demonstration) আমাদের দিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন অনুধ্যান করলেই আমরাও উদ্বুদ্ধ হয়ে তা সাক্ষাৎভাবে নিজ জীবনে অনুসরণ করতে পারব।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

নারীর জাগরণের জন্য চাই আলো অর্থাৎ উপযুক্ত শিক্ষা। নারীদের শিক্ষিত করতে হবে, কিন্তু সেখানে পুরুষের কর্তৃত্ব থাকবে না। নারী শিক্ষিত হয়ে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবে। তাই স্বামীজীর কথায় পাই ঃ "তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে, কোন্ জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক। তাহাদের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কথা বলিবার তোমরা পুরুষরা কে?" শিক্ষার অর্থ আত্মিক বিকাশ। সারদাদেবী লিখতে পারতেন না। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একসময়ে বলেছিলেন ঃ "কেহ যেন মনে না করেন তিনি (সারদাদেবী) অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক মাত্র।"[২] তাঁকে রোজ সংবাদপত্র ও রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকা নিয়মিত পড়ে শোনানো হতো। জয়রামবাটী, কোয়ালপাড়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মেয়েদের করুণ অবস্থা দেখে মা দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন ঃ "এদেশের মেয়েরা সব পশুর মতো দেখছি। আমার একেক সময় মনে হয়, এদের শেখাবার ব্যবস্থা করি।"[৩] সারদাদেবীর পড়াশোনার প্রতি কী প্রবল আগ্রহই না ছিল! মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক অবমাননা ও বঞ্চনার শিকার তাঁকে হতে হয়েছিল, তাঁর হাত থেকে হৃদয় 'বর্ণপরিচয়' কেড়ে নিয়েছিলেন। কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন ঃ "মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই; শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে?" তাই শ্রীমা শেষে রামায়ণাদি বই পড়তে পারতেন; লিখতে পারতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের অমূল্য উপদেশ লিখে রাখতে পারেননি বলে দুঃখ করতেন। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের মেয়েরা মায়ের নিকট আসত। একদিন দুটি মাদ্রাজি মেয়ে এসেছিল। মা জানতে পারেন যে, তারা ইংরেজি জানে। মা তাদের জিজ্ঞাসা করছেন, 'আমরা বাড়ি যাব'-এর ইংরেজি অনুবাদ কী হবে? উত্তর শুনে মা খুব খুশি হন; হাসতে থাকেন। মায়ের ইচ্ছা জেনে মেয়েদুটি পরে দুটি মাদ্রাজি গানও মাকে গেয়ে শোনায়। মা শুনতে শুনতে খুব আনন্দ করতে লাগলেন।

মায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধুর বয়স তখন চোদ্দ বছর। মায়ের বাড়ির (উদ্বোধনের) কাছে একটি মিশনারি স্কুলে পড়ে। রাধু খেয়েদেয়ে কাপড় পড়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এমন সময় গোলাপ মা এসে মাকে অনুযোগ করে বলেন ঃ "বড় হয়েছে মেয়ে, এখন আবার স্কুলে যাওয়া কী?" মা কিন্তু বললেন ঃ "কী আর বড় হয়েছে, যাক না।" শ্রীমায়ের দৃষ্টিতে নারী আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও স্বনির্ভর হবেন। মা বলছেন ঃ "লেখাপড়া, শিল্প—এসব শিখতে পারলে কত উপকার হবে। যে-গ্রামে বিয়ে হয়েছে—এসব জানলে নিজের এবং অন্যেরও কত উপকার করতে পারবে।" রাধু স্কুলে গেল।[৪]

শিক্ষার উদ্দেশ্য বলতে শ্রীমা বুঝতেন, শিক্ষার্থীর মধ্যে নব ও মৌলিক চিন্তার উন্মেষ ঘটানো। গৌরী মার আশ্রমের মেয়েদের উদ্দেশে বলেছিলেন ঃ "মেয়েদের বুঝিয়ে দিও, তারা কেবল থোড়বড়ি খাড়া আর খাড়াবড়ি থোড় করতেই এজগতে আসেনি।"[৫] জ্ঞানের অন্বেষা শিক্ষার প্রাণ। তাই শ্রীমা নিবেদিতা বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে বললেন ঃ "দেখ মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখে রাখবে; আর যেখানে থাকবে সেখানকারও সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না।"[৬] নারী ঘরের ঘেরাটোপের অন্তরে চিরকাল অন্তরালবর্তিনী হয়ে থাকবেন, মা তা চাইতেন না। এক স্ত্রীভক্ত উদ্বোধনের বাড়ি থেকে গৌরী মার আশ্রমে হেঁটে যেতে ইতস্তত করছেন। মা তাঁকে বললেন ঃ "পায়ে হেঁটে যাবে, একাই যাবে। চিরদিনই কী তুমি ছেলেমানুষ থাকবে? যাও—এস গে।"[৭]

গৌরী মাকে শ্রীমা সর্বদা সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, যাতে তাঁর আশ্রমের মেয়েরা স্বাধীন হয়ে জীবনযাপনে সমর্থা হয়ে ওঠে। গৌরী মা কী অভাবনীয় সামাজিক, ধর্মীয় সর্বপ্রকারের বাধাকে বীরত্বের সঙ্গে অতিক্রম করে এগিয়ে গেছেন। শ্রীমা তাঁকে বলছেন ঃ "কারো কোন অনুনয়, পরামর্শ বা তিরস্কারে নিজের আদর্শ ছাড়লে চলবে না, শক্ত হতে হবে। শক্ত তিনকুল মুক্ত।"[৮] গৌরী মার স্বাধীন চেতনাকে প্রশংসা করে মা বলতেন ঃ "গৌরীদাসী কি মেয়ে?... ওর মতো কটা পুরুষ আছে? এই গাড়ি ঘোড়া—সব করে ফেললে।" "যে বড় হয় সে একটিই হয়, তার সঙ্গে তুলনা হয় না। যেমন গৌরীদাসী।"[৯]

ভগবদ্‌কেন্দ্রিক জীবন

'ত্যাগীর বাদশা' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে যদি কেউ সন্ন্যাসীর আদর্শ বলে গ্রহণ করেন, তবে আমরা শ্রীমায়ের জীবনকে অতি সহজেই গৃহিজীবনের আদর্শ বলে দাবি করতে পারি। কারণ, মায়ের জীবনীপাঠে প্রত্যেক গৃহী—তিনি পুরুষ হতে পারেন বা নারীও হতে পারেন—নিজ জীবনের লক্ষ্য ও তাতে পৌঁছানোর উপায় অভ্রান্তরূপে দেখতে পান। তাঁদের চোখ খুলে যায়, এক উচ্চতর জীবনের সন্ধান পান। ঈশ্বরকেন্দ্রিক অধ্যাত্মজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি যেন তাঁদের চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। শ্রীমায়ের সংসারের প্রত্যেকেই

যেন এক-একটি সমস্যা ছিলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ-কৃত জীবনী থেকে একটি চিত্র উদ্ধৃত করা যাক। "ভ্রাতাদের স্বার্থবুদ্ধি, ভ্রাতুষ্পুত্রীদের পরস্পর হিংসা, নলিনীদিদির শুচিবায়ু, রাধুর বাতুলসদৃশ আবদার এবং ছোটমামির পাগলামি—এইসকল মিলিয়া যে অবর্ণনীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি হইত, তাহাতে একমাত্র ধৈর্যময়ী শ্রীমায়ের পক্ষেই শান্তভাবে সংসারে কাজ করা সম্ভব ছিল।"[১০] এটি মায়ের সংসারের একটি দিক, অর্ধভাগমাত্র। অপরদিকের চিত্রটি এরকম ঃ মা তখন উদ্বোধনের বাড়িতে অবস্থান করছেন। "বেলা পড়ে আসতে সমাগত ভক্তমহিলাগণ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে একে একে বিদায় নিতে লাগলেন, কেহ বা আরতি দেখে যাবেন বললেন। শ্রীশ্রীমা কাপড় কেচে এসে ঠাকুরের বৈকালী-ভোগ দিয়ে প্রত্যেককে প্রসাদ দিলেন।

"ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। মা রাধু, মাকু প্রভৃতিকে ঠাকুরঘরে এসে জপ করতে বসতে বললেন। তারা আসতে বিলম্ব করায় মা অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, 'সন্ধ্যার সময় এখন এসে সব জপটপ করবে, না কোথায় কী করছে দেখ।' একটু পরে তারা এসে জপ করতে বসল।"

"ভূদেব মহাভারত পড়ছিল। ছেলেমানুষ, পড়তে দেরি হচ্ছিল, মাকে এখন শীঘ্র উঠতে হবে, কারণ প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। সেজন্য তিনি ভূদেবকে বললেন, 'একে (সরযূবালাদেবীকে) দে, এ জলের মতো পড়ে দেবে এখন। এ-অধ্যায় শেষ না করে তো উঠতে পারব না।'" সরলাবালা উক্ত অধ্যায়ের পাঠ শেষ করলেন। "মহাভারতকে মা হাতজোড় করে প্রণাম করে সকলে উঠে পড়লেন।... মা নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে জপে বসলেন।

"জপান্তে হরিবোল, হরিবোল করে উঠে ঠাকুরপ্রণাম করে সকলকে প্রসাদ দিলেন।... মা বললেন, 'সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ-মন ভাল থাকে। আমি যখন আগে জয়রামবাটী ছিলুম, দিনরাত কাজ করতুম।"[১১] মায়ের এই কথা থেকে স্ত্রী-পুরুষ সকলে নতুন প্রেরণা পাচ্ছেন; নতুন উদ্যমে কর্মতৎপর জীবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। ভারতের মতো দরিদ্র দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতিপ্রকল্পে কর্মোদ্যমের আবশ্যকতা বলাই বাহুল্য।

মায়ের বাড়ির সামনের মাঠ থেকে এক দরিদ্রা হিন্দুস্থানী নারী তার রুগ্ন শিশুকে কোলে করে মায়ের আশীর্বাদ নিতে এসেছেন। মা শিশুটিকে আশীর্বাদ করলেন ও কিছু ফল দিলেন, বলে দিলেন শিশুর মাকে ঃ "তোমার রোগা ছেলেকে খেতে দিও।"[১২]

সাধারণ গৃহিণীর জীবনে প্রায়ই লক্ষিত হয় এক বেদনাভরা হীনমন্যতা, 'আমরা আর কী করতে পারি, আমরা সংসারী!' 'আমরা তো অভাবী!' 'আমরা মেয়ের জাত!' ইত্যাদি। শ্রীমাও প্রতিবাদের সুরে একবার বলেছিলেন ঃ "আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?" কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিবাদ ও পরে সুদক্ষ প্রশিক্ষণে মায়ের মন থেকে এই ভাব চিরতরে কেটে যায়। মায়ের জীবনে দেখি এক সদর্থক দৃষ্টি, এক নতুন ভগবদ্‌কেন্দ্রিক জীবনধারা। তাতে আছে প্রচণ্ড সংগ্রাম, কিন্তু কোন উদ্বেগ নেই। কারণ, সাফল্য বা প্রশংসা অর্জন তাঁর লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল জীবনসংগ্রামকে সাহসভরে সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করা। তাঁর মধ্যে দেখি, অদোষদৃষ্টি, অপার সহনশীলতা, প্রবল কর্মোদ্যম, সীমাহীন মাতৃস্নেহ। তারই ফলে সমাজ ও সংসারের বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান করেও তাঁর মনে কোন অশান্তি বা দুঃখ ছিল না।

আদর্শ পত্নী

সারদাদেবী ছিলেন 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা', পতিপরায়ণা। তাঁর মন-প্রাণ পতির সেবায় সর্বদা নিয়োজিত ছিল। তিনি ছিলেন সেবাপরায়ণা। শ্রীমা স্মৃতিচারণ করেছেন, দুই হাত দেখিয়ে—ঠাকুরের ভাত বাড়বার সময় ঃ "ভাতকে টিপেটিপে কম দেখাবে বলে সরুটি করে দিতুম। তিনি বেশি ভাত দেখলে ভয় পেতেন। গয়লার দুধ আধসের করে দিবার কথা; দিবার সময় অন্য জায়গায় বিক্রি করে যে-দুধটা বাঁচত, সবটা দিয়ে যেত। আমি সেটাকে ফুটিয়ে ঘন করে রাখতুম।"[১৩]

তেমনি দেখি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমায়ের সমপ্রাণতা। লছমিনারায়ণ মাড়োয়ারি ঠাকুরকে প্রচুর টাকা দিতে এলেন। তিনি গ্রহণ করলেন না; নহবতে শ্রীমায়ের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। মাও সেই দান গ্রহণ করতে পারলেন না; মা তার কারণ বললেন ঠাকুরকে ঃ "আমি নিলে ওটাকা তোমারই নেওয়া হবে; কারণ, আমি রাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যক খরচ না করে থাকতে পারব না; ফলে ওটা তোমারই নেওয়া হবে।"[১৪]

বালকভক্ত সারদাপ্রসন্নকে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমায়ের কাছ থেকে গাড়িভাড়ার পয়সা নিতে বলেছিলেন। প্রতি বারে বাড়ি ফেরার সময় সারদাপ্রসন্ন নহবতের দরজার সামনে দেখতে পেত, চারটি পয়সা রাখা আছে। সে অবাক হয়ে ভাবত, ঠাকুর তো পয়সা দেওয়ার কথা কাউকে দিয়ে বলে পাঠাননি, মা কীভাবে এই পয়সা দেওয়ার কথা জানতে পারলেন? শ্রীমা স্বয়ং একদিন নহবতে এই রহস্য ভেদ করে বলেছিলেন ঃ "হ্যাঁ বাবা, কথা সত্যি। আমি নহবতে হাজার কাজ নিয়ে থাকলেও আমার মন সর্বদা ঠাকুরের কাছে পড়ে থাকত। অত দূর থেকে আস্তে আস্তে বললেও আমি সব কথা শুনতে পেতুম। ঠাকুরের মুখে ঐকথা শুনেই আমি চারটি পয়সা রেখে

দিয়েছিলাম।" স্বামী অভেদানন্দ সম্ভবত এই কারণেই মাকে 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা', 'তন্নামশ্রবণপ্রিয়া', 'তদ্ভাব-রঞ্জিতাকারা' বলে প্রণাম জানিয়েছেন।[১৫]

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিতে পত্নীর যে সর্বোচ্চ আদর্শ অঙ্কিত হয়েছে, সেই আদর্শে বা ততোধিক উচ্চ স্তরে শ্রীমা অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেই মুহূর্তে, যখন যুগাবতার সেইসঙ্গে নিজ পতি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ "কি গো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?" বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে শ্রীমা উত্তর দিয়েছিলেনঃ "না, আমি সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" কেবল প্রতীচ্যে নয়, প্রাচ্যেও শান্তিপূর্ণ পরিবার বিরল হয়ে আসছে। এর প্রধান কারণ, পরিবারের মধ্যে স্বামী ও তৎপত্নীর মধ্যে সমন্বয়ের অত্যন্ত অভাব, ফলে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব ক্রমে বেড়ে চলেছে। আজ মানুষের জীবনে বড় দুঃখ! পুরাণোক্ত সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর নাম বা তাঁদের আদর্শের স্মৃতি সেই দুঃখের সঙ্গে হতাশাকে যুক্ত করে। তাই একই চন্দ্র-সূর্যের নিচে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদার মধ্যে যে অপূর্ব পারস্পরিক আস্থা ও ভালবাসার লীলা আমাদের সম্মুখে সঙ্ঘটিত হল—তা আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা।

আদর্শ জননী

মাতৃত্ব ভারতীয় নারীর সর্বোচ্চ আদর্শ। মায়ের কথায় পাইঃ "আমি মা, সকলের মা।" "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।" যাদের শক্তিতে ভারত তখন পরাধীন ছিল, যাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে কত মানুষ সংগ্রাম করেছিলেন, কত তাজা প্রাণ ফাঁসিমঞ্চে নিবেদিত হয়েছিল—সেই ইংরেজ সম্বন্ধে সেইসময়ে শ্রীমায়ের উক্তি এককথায় 'অভিনব'। তিনি বলেছিলেনঃ "ওরাও তো আমার ছেলে।" মাতৃত্বের নজিরবিহীন আদর্শ শ্রীমা দেখালেন, শ্রীরামকৃষ্ণও মাতৃত্বের সেই অদ্ভুত প্রকাশকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শ্রীমা তখন তদ্গতচিত্ত হয়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় সদা নিরতা। একদিন শ্রীমা একটি থালায় করে ঠাকুরের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিলেন। এক রমণী, যাঁর চরিত্রে আবিলতা ছিল, সেখানে এসে মাকে বলেনঃ "মা, আমায় দিন।" ঐ রমণী মায়ের কাছ থেকে থালাটি নিয়ে ঠাকুরের ঘরে রেখে প্রস্থান করেন। শুদ্ধস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ থালা স্পর্শ করতে পারছেন না। ঠাকুর অশুদ্ধ স্পর্শের ফলে প্রতিবাদ করেন; মা উত্তরে বলেনঃ "তা জানি; আজ খাও।" ঠাকুর বললেনঃ "আর কোনদিন কারো হাতে দেবে না, বল।" মায়ের মুখ থেকে তখন জগতের ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব সেই মন্তব্য বেরিয়ে এলঃ "তা তো আমি পারব না ঠাকুর! তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব; কিন্তু আমায় 'মা' বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না। আর তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও—তুমি সকলের।" ঠাকুর তখন প্রসন্ন হয়ে আহারে সম্মত হলেন। পতি শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর নিজের দাবিকে ত্যাগ করার মতো ঔদার্য শ্রীমায়ের ছিল; আত্মসুখ ত্যাগ করেছিলেন বলেই তিনি হলেন আজ বিশ্বজনের জননী, বিশ্বজননী।

আত্মমর্যাদাসম্পন্না নারী

পরাশ্রয়ী ভাব নারীর দুর্বলতার প্রধান লক্ষণ। অপরের নিকট থেকে আনুকূল্য বা আশ্রয় প্রার্থনা শ্রীমায়ের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। একবার শ্রীমা সঙ্গিনীদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছিলেন। কথা ছিল আরামবাগে পৌঁছে এক রাত বিশ্রাম নিয়ে পরদিন তারকেশ্বরে যাওয়া হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে আরামবাগে পৌঁছানোয় মায়ের সঙ্গীরা ভাবলেন সেদিনই দ্রুতপদে তারকেশ্বরে পৌঁছাবেন। শারীরিক অসামর্থ্য সত্ত্বেও মা কষ্ট করে তাঁদের সঙ্গে চললেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্তি ও যন্ত্রণায় বারবার তাঁর গতিরোধ হতে থাকল। তখন নিজে 'এতগুলি লোকের অসুবিধা ও আশঙ্কার কারণ' হয়েছেন ভেবে তেলোভেলোর প্রান্তরে আসন্ন বিপদের সম্মুখীন শ্রীমা তাঁর সঙ্গিনীদের বলে দিলেন তারকেশ্বরের চটিতে পৌঁছে বিশ্রাম করতে, পরদিন তিনি তাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। সঙ্গিনীরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে একা ছেড়ে এগিয়ে গেলেন। শ্রীমা একাকী যেতে যেতে কিছুক্ষণ পর নির্জন আঁধার প্রান্তরে সেই ভয়ঙ্কর ডাকাতের সামনে পড়ে গেলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি শ্রীমা ডাকাতকে বললেনঃ "বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমি বোধহয় পথ ভুলেছি; তুমি আমাকে সঙ্গে করে যদি তাদের কাছে পৌঁছে দাও! তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। তুমি যদি সেখান পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও তাহলে তিনি তোমায় খুব আদরযত্ন করবেন।" ততক্ষণে ডাকাতের স্ত্রী কাছে এসে পড়েছে। শ্রীমা তখন বিশ্বাস ও প্রেমভরে সেই স্ত্রীলোকের হাত ধরে বললেনঃ "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলুম; ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নইলে কী করতুম বলতে পারি নে।"[১৬] নরঘাতক ডাকাতের সম্মুখে একজন পল্লিরমণীর কী অদ্ভুত চিত্তস্থৈর্য! কী প্রশান্তি!

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে অদৃষ্টপূর্ব কঠোর সাধনসাগরে নিমগ্ন। তাঁর তখন দিব্যোন্মাদ অবস্থা। গ্রামের সাধারণ মানুষ উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার মর্ম অনুধাবনে অসমর্থ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে জল্পনা-কল্পনার ঝড় উঠেছিল জয়রামবাটীতে। পল্লিরমণীরা শ্রীমাকে দেখিয়ে বলত 'পাগলের স্ত্রী', সহানুভূতিচ্ছলে বলতঃ "ওমা, শ্যামার

মেয়ের খেপা জামাইয়ের সঙ্গে বে হয়েছে” ইত্যাদি। শ্রীমা সিদ্ধান্ত নিলেন ঃ “সবাই এমন বলছে, আমি গিয়ে একবার দেখে আসি কেমন আছেন।” তিনি ভাবলেন ঃ “বিধাতার নির্বন্ধে যদি ঐরূপই (মস্তিষ্কবিকৃতি বা ঐরূপ অবস্থান্তর) হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার তো আর এখানে থাকা কর্তব্য নহে, পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্তা থাকাই উচিত।” শ্রীমায়ের গৃহীত এই বিচক্ষণ সিদ্ধান্তে তাঁর পিতা রামচন্দ্র পূর্ণ সমর্থন জানান ও স্বয়ং কন্যাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসেন।

আধুনিক ভারতের দাবি—নারী নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবেন, স্বাবলম্বী হবেন। ভাবতে অবাক লাগে, বহুযুগ পূর্বে শ্রীমা মেয়েদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি অর্থকরী শিক্ষার প্রসারেও আগ্রহী ছিলেন। বাংলার ছোট ছোট শিল্পশিক্ষা, সঙ্গীতশিক্ষা, এমনকী ব্রাহ্মণ মেয়েদেরও তিনি নার্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এক যুবতী মেয়ের মা তাঁকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন ঐ মেয়েকে বিবাহ করতে আদেশ করেন; কেননা সে বিবাহ করতে নারাজ। শ্রীমা কিন্তু সেই অনুরোধ রাখতে পারলেন না। তিনি বললেন ঃ “সারাজীবন পরের দাসত্ব করা, পরের মন যোগানো—এ কী কম কষ্টের কথা!”[১৭] সহনশক্তির কথা শ্রীমা বারবার বলেছেন; কিন্তু তা পূর্ণ আত্মমর্যাদার ওপর প্রতিষ্ঠিত। মা একসময়ে বলেছেন ঃ “সন্তানদের অনেককে তো দেখি, নিজেদের ভুলত্রুটি অপরাধের ইয়ত্তা নেই, তবু তারা চায় বউ-ঝিরা তাদের কাছে নত হয়ে থাকুক। এই অন্যায়ের ফলে যে-দিন আসছে, মেয়েরা আর পৃথিবীর মতো সইবে না।”[১৮] বিবেচনাহীন স্নেহের দ্বারা শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের বালক-ভক্তদের ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করছেন—একদিন এই কথা শুনে শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন ঃ “ও (বাবুরাম) দুখানি রুটি বেশি খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি করো না।”[১৯]

শ্রীমা সারদাদেবী ছিলেন সদা আত্মপ্রতিষ্ঠ। এক ভক্ত রমণীকে তিনি বলেছিলেন ঃ “কারো কাছে কিছু চেও না, বাপের কাছে তো নয়ই, স্বামীর কাছেও নয়।”[২০] বস্তুত, শ্রীমা স্বয়ং ছিলেন তাঁর বাণীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত। আমাদের আদর্শ যেমনটি হওয়া উচিত, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে গিয়েছেন তিনি। একবার এক শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত অপর এক ভক্তকে বলেছিলেন ঃ “মঠে-ফঠে আর এখন কিছু নেই।” শ্রীমা একথা শুনে চমকে উঠেছিলেন, বলেছিলেন ঃ “যদি এখনো ধর্ম কিছু থাকে তো সে এখানে (তাঁর কাছে), আর মঠে।”[২১]

এক ব্যতিক্রমী জীবন

আমরা অবাক হয়ে যাই যখন ভাবি, একজন ব্রাহ্মণ বিধবা রমণী সধবার বেশ ও চিহ্ন ধারণ করে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর জয়রামবাটী এবং কলকাতার গোঁড়া সমাজ বাগবাজার বা তার উপকণ্ঠে জীবন কাটালেন! তিনি তাঁর জীবনের এই স্বকীয়তা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। আর এই স্বকীয়তাই তাঁর জীবনকে আর পাঁচটি জীবন থেকে পৃথক করে রেখেছে। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মায়ের সম্বন্ধে বলতেন—‘গণ্ডিভাঙা মা’।

ভারতে নারীদের জাগরণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে এনেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন ইউরোপীয়ান। তাঁকে এখানে মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে হলে রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক তাঁকে গৃহীত হতে হবে। এই গ্রহণের বিষয়টি শ্রীমাই করলেন। মা তখন বাগবাজারে বাস করছেন। তিনি নিবেদিতাকে কেবল সাদরে গ্রহণই করলেন না, তাঁর সঙ্গে একত্র খেলেনও। মায়ের উদারতা দেখে স্বামীজীও অবাক হয়েছিলেন। নিবেদিতা বিস্ময়ান্বিত হয়ে লিখেছেন ঃ “এর (এই ঘটনার) দ্বারা আমরা জাতে উঠেছি, এবং আমাদের ভাবী কাজের পথ পরিষ্কার হয়েছে, যা অন্য কিছুতে হতে পারত না।”[২২] শ্রীমা বাগবাজারের অন্য মানুষদেরও জাগালেন, জাতবিচারের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে উদ্ধার করলেন। “একবার নিবেদিতা ভোগ রেঁধে ঠাকুরকে নিবেদন করে তার প্রসাদ শ্রীমাকে খেতে দেন। শ্রীমা পরম আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন। এর ফলে গোঁড়া মেয়েমহলে চাঞ্চল্য পড়ে যায় এবং তাঁরা শ্রীমায়ের কঠোর নিন্দা করেন। বিরক্ত ও ব্যস্ত হয়ে শ্রীমা বলেন, ‘নিবেদিতা আমার মেয়ে, ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করার অধিকার তার আছে; তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে, কোন দ্বিধা না রেখে আমি নেব; যদি কারো তাতে আপত্তি থাকে, সে নিজেকে নিয়েই থাক।’”[২৩] অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়, শ্রীমা কী কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিদ্রা থেকে ব্যুত্থিত করেছেন।

প্রথমে একটু সঙ্কোচ হলেও মা একজন ইউরোপীয়ান ফটোগ্রাফারের সামনে বসে ছবি তুলতে রাজি হয়েছিলেন। তৎকালীন সমাজে এই ঘটনা অভাবনীয় ছিল। নিবেদিতা স্কুলের মেয়েদের ফটো খবরের কাগজে ছাপানো হলে সমাজের গোঁড়া মহলে প্রতিবাদ হয়েছিল। কিন্তু মা নিবেদিতার পক্ষকে সমর্থন করেছিলেন।

মা ছিলেন লজ্জাশীলা—‘লজ্জাপটাবৃতা’। মায়ের কথায় পাই ঃ “স্ত্রীলোকের লজ্জাই হলো ভূষণ।”[২৪] সহনশক্তি সম্বন্ধে বলতেন ঃ “সহ্যগুণ বড় গুণ—এর চেয়ে আর গুণ নেই।”[২৫]

কিন্তু যে-স্থলে মনুষ্যত্বের অবমাননা, সে-স্থলে মা কঠোর হয়েছেন। উদ্বোধনের পাশে গরিব বস্তিতে একদিন এক পুরুষ তার স্ত্রীকে বেদম মারতে থাকে। প্রথমে কিল, চড়, পরে এমন লাথি মারল যে, কোলে ছেলেসুদ্ধ স্ত্রীলোকটি গড়িয়ে এসে উঠোনে পড়ল। সেখানেও তার ওপর আরো কয়েক ঘা লাথি। মা তখন জপে বসেছিলেন। এই নিষ্ঠুরতায় মায়ের জপ বন্ধ হয়ে যায়। অমন যে লজ্জাশীলা মা, একেবারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে উঠে তীব্র ভর্ৎসনায় বললেনঃ "বলি ও মিনসে, বউটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি, আঃ মলো যা!" ক্রোধোন্মত্ত লোকটি একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করল ও বউটাকে ছেড়ে দিল।[২৬]

প্রয়োজনবশে মা রুদ্রাণী রূপও ধারণ করতেন, শারীরিক প্রহার করতেও দ্বিধা করেননি। ভক্ত হরিশের পাগলামি একদিন অত্যন্ত বেড়ে যায়। মা তখন সেখানে একা। নিজের ভাষায় মা বর্ণনা দিয়েছেন ঃ "আমি নিজমূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে, গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙুল লাল হয়ে গিছল।"[২৭]

পতিতোদ্ধারিণী মা সারদা

উনিশ শতকে বঙ্গনাট্যমঞ্চ ছিল ভদ্রঘরের মানুষের নিকট অপাঙ্‌ক্তেয়, অপবিত্র। যবনিকার অন্তরালে থাকা নট-নটীরা মানবিক মর্যাদা ফিরে পেয়েছিল, যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্গরঙ্গমঞ্চে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে 'আসল নকল' এক দেখেছিলেন ও তাঁদের আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু সমাজ তখনো তাঁদের স্বীকৃতি জানায়নি। গবেষক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠেছেন সারদাদেবী। তাঁর উপস্থিতি, সান্নিধ্য ও আশীর্বাদ শিল্পিমহলে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। কারণ, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শিল্পীরা তখনো পর্যন্ত 'মানহারা মানবে'র দলে।"[২৮] শ্রীমা নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে কৃপা করেছেন। তাঁরই অনুরোধে মিনার্ভা থিয়েটারে তিনি 'বিল্বমঙ্গলঠাকুর' নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। শ্রীমা কৃপা করেছিলেন অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি, মাতাল অভিনেতা বিনোদবিহারী সোম (পদ্মবিনোদ)-কে। শ্রীমা অপরেশচন্দ্র-রচিত নাটক 'রামানুজ' দেখতে মিনার্ভা থিয়েটারে গিয়েছিলেন। সেদিন থিয়েটার শেষ হয়ে যাওয়ার পর অপরেশবাবু লক্ষ্মণের স্ত্রী চম্পার ভূমিকায় অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরীকে বলেন ঃ "ওপরে যা, সারদা মা এসেছেন, তোকে ডাকছেন।" নীরদাসুন্দরী সেই অভিনয়ের পোশাকেই ছুটলেন মায়ের দর্শনে। মা তাঁকে কোলে টেনে নিয়ে সস্নেহে চুম্বন করেছিলেন। তৎকালীন রঙ্গমঞ্চে একজন পতিতা অভিনেত্রীর কাছে এটি অকল্পনীয় সৌভাগ্য। এই ঘটনা সেদিন এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অপরেশচন্দ্র লিখেছেন ঃ "মানুষ খোলটা দেখে। ভগবান খোলের ভিতরটা দেখেন, আর ভিতরটা দেখেন বলিয়াই নিজে দেখিয়াছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজননী মা আমার, এই দেশের রঙ্গালয়ের কোন পতিতা অভিনেত্রীকে কোলে করিয়া জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন—ভগবানের দয়া কাঁটাগাছকে বাছে না—সে-দয়ার পাত্রাপাত্রী নাই, সে-দয়া বিচার করে না, ব্যাবহারিক জগতের কোন বিধিনিষেধ মানে না; সে কেবল জাতিনির্বিচারে সকলকে পবিত্র করিয়া লয়।"[২৯]

শক্তিদায়িনী মা

নারী শক্তিস্বরূপা, সর্বকল্যাণময়ী। শ্রীমা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা, দেবী 'সারদা-সরস্বতী' ও 'জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী'। তিনি সাধারণত স্বরূপ ঢেকে রাখতেন, তবে কখনো কখনো তা প্রকাশিত হয়ে পড়ত। অশুচিগ্রস্ত হওয়ায় পাচিকা শ্রীমায়ের রান্নাঘরে আসতে পারছেন না। শ্রীমা তাঁকে পবিত্র গঙ্গাজল ধারণ করতে বললেন। তাতেও তাঁর মন সায় দিল না। মা তখন বললেন ঃ "তবে আমাকে স্পর্শ কর।"

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমায়ের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে হৃদয়কে অবহিত করেছিলেন। মায়ের প্রতি হৃদয়ের বিপরীত ব্যবহার দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন ঃ "ওরে হৃদে, (নিজ দেহ) একে তুই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে (শ্রীমাকে) আর কখনো এমন কথা বলিসনি। এর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস; কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।"[৩০] স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীমা ছিলেন আধুনিক জগতের নারীজাগরণের 'Central figure' (কেন্দ্রস্বরূপা)। তাঁর কথায় পাই ঃ "আমাদের মা আধ্যাত্মিক শক্তির একটি বিশাল আধার, যদিও বাইরে সমুদ্রের মতো প্রশান্ত। তাঁর আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছে।"[৩১]

স্বামীজী মায়ের জীবন ও কথার মধ্যে কী পরিমাণে আস্থা ও শক্তি অনুভব করতেন, তার এক প্রমাণ পাশ্চাত্যদেশে তাঁর ঐতিহাসিক সাফল্য। তিনি আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারে ঠাকুরের অনুমোদন অলৌকিক উপায়ে লাভ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর মন দ্বিধান্বিত ছিল। তিনি ভাবলেন ঃ "আচ্ছা, শ্রীশ্রীমা তো ঠাকুরের অংশস্বরূপিণী; তাঁকে একখানি পত্র লিখলে হয় না? তিনি যেরূপ বলবেন, সেরূপই করব।" স্বামীজী তখন নির্দেশ চেয়ে মাকে এক পত্র লিখলেন। শ্রীমা তার উত্তরে তাঁর আশীর্বাদ ও অনুমতি জানালেন। স্বামীজী ঐ পত্র পেয়ে সমস্ত সন্দেহ, দ্বিধা থেকে মুক্ত হলেন। বললেন ঃ

"আঃ, এতক্ষণে সব ঠিক হল; মারও ইচ্ছা আমি যাই।" স্বামীজী মায়ের আশীর্বাদকেই তাঁর সাফল্যের প্রধান শক্তিরূপে গণ্য করতেন। পশ্চিম দুনিয়া থেকে ফিরে একদিন স্বামীজী শ্রীমাকে বলেছিলেনঃ "মা, আপনার আশীর্বাদে এ-যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরি জাহাজে চড়ে সে মুলুকে গিয়েছি।"[৩২]

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে বলেছিলেনঃ "দেখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।" শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর মা সেই মহান ব্রত পালন করলেন। তিনি শুধু 'কলকাতার লোকগুলো'র নয়, জগতের সকলকে তাদের অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তির সন্ধান জানিয়ে গেলেন। মানুষ আজ মায়ের প্রত্যেক কথা থেকে কী গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করছে, চেতনা লাভ করছে—যে-চেতনার দ্বারা মানুষ জীবনক্ষেত্রে নির্ভীক বীরের ন্যায় যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়। মায়ের আশীর্বাদঃ "মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন 'মা' আছেন।"[৩৩] সন্তান ভাবেঃ মা আমার পরম আশ্রয়; 'আসুক না যম, জিনব অবহেলে।' কারণ, আমরা মায়ের ছেলে। স্বামীজী রাজযোগ-এ বলেছেনঃ "জ্ঞানই শক্তি।" মা যেমন জ্ঞানস্বরূপা, তেমনি শক্তিস্বরূপা। নারীরা মায়ের ভাবাদর্শে কত উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তা জানা যায় ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ননীবালাদেবীর এক ঘটনায়। ইংরেজ সরকার তাঁকে বন্দি করে শেষে নিয়ে আসে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়, তা সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করা যায়নি। জেলে তিনি আহারাদি বন্ধ করে দেন। পুলিশের কর্তারা তাঁকে অনুরোধ করেও কোন ফল হয় না। তখন গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট গোল্ডি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি আহার গ্রহণ করলে তাঁর যেকোন ইচ্ছাপূরণে তাঁরা রাজি আছেন। ননীবালাদেবী বললেনঃ "আমাকে বাগবাজারে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্ত্রীর কাছে রেখে দিন, তাহলে খাব।" গোল্ডি বললেনঃ "আপনি দরখাস্ত লিখে দিন।" ননীবালাদেবী তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত লিখে দিলেন। কিন্তু গোল্ডি সেটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। আহত সিংহীর মতো ননীবালাদেবী সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দেন গোল্ডির মুখে।[৩৪]

চৈতন্যদায়িনী মা

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শীরূপে পুজো করলেন। আর মা সেই পুজো দেবীরূপে গ্রহণ করলেন। এই পুজোর মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎসমক্ষে সারদাদেবীকে জগন্মাতারূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। স্বামী শিবানন্দ বলতেনঃ "ঠাকুর নিজ সাধনার দ্বারা জগতের ব্রহ্মকুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে গেলেন। তাই এই অসীম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মকুণ্ডলিনীস্বরূপা সারদাদেবীকে জাগরিত করলেন, নিজ দেবীত্ব সম্বন্ধে মাকে অবহিত করলেন।" একথার সমর্থন পাওয়া যায় মায়ের জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দের কথায়ঃ "যাঁহাকে ঠাকুর অতঃপর স্বীয় লীলা সম্পূরণের জন্য রাখিয়া যাইবেন, তাঁহাকে অন্তরের পূজা প্রদানপূর্বক নিজসকাশে ও জনসমাজে সম্মানিত ও মহিমমণ্ডিত এবং সেই দেবীকে স্বীয় শক্তিবিষয়ে অবহিত করার প্রয়োজন ছিল। এইজন্যই ষোড়শীপূজার আয়োজন।"[৩৫] যুগদেবতা যুগজননীকে জাগালেন; এখন মা জগৎকে জাগাচ্ছেন।

স্বামীজী চেয়েছিলেন, মেয়েরা শ্রীমাকে কেন্দ্র করে জেগে উঠবে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, মেয়েরা আজ জেগেছেন। ক্রমে ক্রমে মেয়েরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন। শিক্ষা ও সাহিত্যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে, শিল্প ও সংস্কৃতিতে—সর্বত্র মেয়েদের অবস্থান অতীতের তুলনায় অনেক বেশি দৃঢ়। বর্তমানে শিক্ষিত মেয়েরা শ্রীমায়ের জীবন ও উপদেশের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরীয় গবেষণামূলক কর্মে রত আছেন।

স্বামীজীর অবর্তমানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট শ্রীমা ছিলেন অনুপ্রেরণাস্বরূপ। জেল থেকে ছাড়া পেলেই তাঁরা মাকে প্রণাম করতে ছুটে আসতেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন শ্রীমায়েরই দীক্ষিত সন্তান। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে মা একবার বলেছিলেনঃ "এইটুকু মানুষ, এঁকেই গবর্নমেন্টের এত ভয়!" বলতেনঃ "আমার বীর ছেলে।" অরবিন্দ-পত্নী মৃণালিনীদেবীকে শ্রীমা 'বৌমা' বলে ডাকতেন।[৩৬]

বিপ্লবী বাঘা যতীন প্রায়শ মাকে প্রণাম করতে আসতেন ও তাঁর আশীর্বাদ লাভ করতেন। সম্ভবত তিনি শেষবারের মতো মাকে প্রণাম করেছিলেন এক ট্রেনযাত্রাকালে। তিনি তখন পলাতক অবস্থায় আছেন, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বাগনান থেকে বালেশ্বর যাচ্ছেন। রেলস্টেশনে জানতে পারেন, শ্রীমা সারদাদেবী ঐ ট্রেনে কোথাও যাচ্ছেন। তিনি সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মায়ের কাছে ছুটে যান ও তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ লাভ করেন।[৩৭] বাঘা যতীনের দেহান্ত হয়েছিল ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর।

মায়ের আবির্ভাবের একশো বছর পূর্তিতে জগতে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ স্বাধীন সন্ন্যাসিনীদের সংগঠন 'শ্রীসারদা মঠ' ও 'সারদা রামকৃষ্ণ মিশন' আত্মপ্রকাশ করে, যার কেন্দ্রে রয়েছেন মা স্বয়ং। এই সংস্থার শাখাকেন্দ্র ভারত-সহ একাধিক দেশে ছড়িয়ে আছে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় শিক্ষিত মেয়েরা এই দুই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে স্বামীজী-প্রদত্ত "আত্মনো

মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" আদর্শে জীবনোৎসর্গ করেছেন। উক্ত সন্ন্যাসিনী-সংঘের বীজস্বরূপ প্রতিষ্ঠান 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'-এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীমা স্বয়ং ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর। শ্রীমা প্রার্থনা করেছিলেন ঃ "আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।"[১৮] শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে কলকাতার বুকে শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ ও শ্রীমায়ের প্রেরণাকে সম্বল করে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসিনী শিষ্যা গৌরী মা প্রেরণাদাত্রীর নামে প্রতিষ্ঠা করেন নারী-সংগঠন 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম'। কেবল সংগঠন নয়, আজ অসংখ্য নরনারীর ব্যক্তিজীবনের কেন্দ্রে শ্রীমা প্রেরণা ও উৎসাহের উৎসরূপে বিরাজমানা।

বহির্ভারতেও মায়ের নামে বেশ কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছে। সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশের বহু মানুষ মায়ের ভাবে মত্ত হয়ে উঠেছেন। আমেরিকান সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা ব্রজপ্রাণার ধারণা, আজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ শ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি অধিকতর আকর্ষণ অনুভব করেন, এমনকী সে-আকর্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর প্রতি আকর্ষণের চেয়েও বেশি। দক্ষিণ আফ্রিকায় একাধিক স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কেবল সন্ন্যাসিনীদের জন্য মঠ 'সারদা আশ্রম' আশেরবিলে নামক এক সুন্দর স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মস্কোতে এক উচ্চশিক্ষিতা রাশিয়ান মহিলা শ্রীমায়ের জীবনী রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করছেন। অনুবাদের কাজ শুরু করার আগে তিনি স্থানীয় আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাতায়াত করতে থাকেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আকর্ষণ অনুভব করেন। কিন্তু একদিন রাত্রে শ্রীমা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন। এর অর্থ বুঝতে না পেরে তিনি সেই আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজের নিকট প্রশ্ন করেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আমি ভাবি, তাঁর প্রতি আকর্ষণও আমার আছে। কিন্তু তাঁর পরিবর্তে সারদাদেবী কেন আমার স্বপ্নের মধ্যে এলেন?" অধ্যক্ষ মহারাজ এই কথা শুনে খুব আনন্দিত হন। কারণ, সেটি ছিল শ্রীমায়ের জন্মদিনের মাত্র কয়েকদিন আগে। মহারাজ ইতিপূর্বে মায়ের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা করেছিলেন ঃ "মা, আমায় এমন এক দেশে রেখেছ যে, কেউ তোমায় চেনে না। আমার সামান্য উপচার, ধূপ-দীপ দিয়েই তোমার পুজো করব।" আর মনে মনে ভাবছিলেন, যদি কোন উপযুক্ত লোক পাই, তবে তাঁকে দিয়ে মায়ের জীবনী রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করিয়ে নেব। এখন উক্ত মহিলার কথা শুনে তাঁর মনে হয়, এর পিছনে মায়ের কোন ইচ্ছা ক্রিয়াশীল রয়েছে। তিনি সেই মহিলাকে বলেন ঃ "তুমি ঠিকই দেখেছ। মা চান, তাঁর জীবনী তুমিই রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ কর।" মহারাজ স্বামী গম্ভীরানন্দ-রচিত ইংরেজি জীবনীগ্রন্থটির এক কপি তাঁর হাতে দেন। মহিলা সেই গ্রন্থের অনুবাদ শুরু করে দিলেন।

ইংল্যান্ডের কভেন্ট্রি শহরে হান্টার ভক্তদম্পতি গড়ে তুলেছেন 'সারদা বেদান্ত সেন্টার'। এখানে প্রার্থনাকক্ষের বেদিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী দুপাশে বসেছেন, শ্রীমা উভয়ের মধ্যস্থলে সমাসীনা।

শ্রীমা সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করে সকলকে জাগাচ্ছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতেন ঃ "হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও।" বাংলাদেশে এক মুসলমান রমণী অস্ত্রোপচার কক্ষে প্রবেশের পূর্বমুহূর্তে নিজ সুশিক্ষিতা কন্যাকে কাছে ডেকে বলেন ঃ "এই মা (নিজেকে দেখিয়ে) যদি অপারেশনের পর ফিরে না আসে, তবে দুঃখ করবে না, জানবে তোমার মা আছেন। তুমি শ্রীমাকে ভালবাস, তাঁকেই ধরে থেক, আমি ছেড়ে গেলেও তিনি তোমায় কখনো ছেড়ে যাবেন না; আমি নশ্বর, তিনি অবিনশ্বর।" গর্ভধারিণী মা আর অস্ত্রোপচার কক্ষ থেকে ফিরে আসেননি। তিনি যথার্থ মা-ই বটে; নশ্বর শরীরে অবিনশ্বর মায়ের সন্ধান দিয়ে গেলেন। অথবা বলা যায়, প্রকৃত মা—জগতের মা স্বয়ং নিজ সন্তানের নিকট নিজেকে প্রকট করলেন গর্ভধারিণী মায়ের মধ্য দিয়ে।[১৯] ❑

তথ্যসূচি

১ দ্রঃ The Second Sex—Simone de Beauvior's Book, 1949 এবং A Short History of Philosophy—Robert C. Solomon & Kathleen M. Higgins, Oxford University Press, 1966, p. 289
২ বাংলার নারীমুক্তি-আন্দোলন এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী—সুস্মিতা ঘোষ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম সং, পৃঃ ১৪৪
৩ ঐ, পৃঃ ১১১
৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০৮, পৃঃ ২২
৫ বাংলার নারীমুক্তি-আন্দোলন, পৃঃ ১১৬
৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ৩৫১
৭ বাংলার নারীমুক্তি-আন্দোলন, পৃঃ ১১৩
৮ ঐ, পৃঃ ১৩৬
৯ ঐ, পৃঃ ১৩৭
১০ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০১, পৃঃ ২৫৪
১১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ৬-৭
১২ ঐ, পৃঃ ৮
১৩ সারদা-অনুধ্যান—স্বামী প্রভানন্দ সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১ম সং, পৃঃ ২০৫
১৪ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৮৩
১৫ সারদা-অনুধ্যান, পৃঃ ২০৫

১৬ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৫৭
১৭ বাংলার নারীমুক্তি-আন্দোলন, পৃঃ ১১১
১৮ ঐ, পৃঃ ১০৩
১৯ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৫৭
২০ বাংলার নারীমুক্তি-আন্দোলন, পৃঃ ৫৫
২১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১১৯
২২ শতরূপে সারদা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১৯৮৫, পৃঃ ১৬২
২৩ ঐ, পৃঃ ১৫১
২৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ২৮৭
২৫ ঐ, পৃঃ ২১১
২৬ ঐ, পৃঃ ৩১
২৭ শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ১২৪
২৮ শতরূপে সারদা, পৃঃ ২৭৯
২৯ ঐ, পৃঃ ২৮২
৩০ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৫৪
৩১ 'Prabuddha Bharata', Vol. LVII, p. 506
৩২ শতরূপে সারদা, পৃঃ ১৬
৩৩ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ৫৯
৩৪ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী—কমলা দাশগুপ্ত, ১৩৭০, পৃঃ ৩৭-৪১
৩৫ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃ ৩৯-৪০
৩৬ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৪৫৭
৩৭ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৪৬২
৩৮ শতরূপে সারদা, পৃঃ ১৪৭
৩৯ জন্মজন্মান্তরের মা—প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা সম্পাদিত, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, ২০০৪, পৃঃ ৪১৩

এই প্রবন্ধটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'রূপে প্রকাশিত হল।—**সম্পাদক**

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

ঋগ্বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা সূর্য। ঋগ্বেদে তেজ বা প্রাণশক্তি-রূপে সূর্যকে বিশ্বচরাচরের আত্মা হিসাবে স্তুতি করা হয়েছে। গুণ-কর্ম-অবস্থা-ভেদে সূর্য বিচিত্র নামে অভিহিত হয়েছেন। তেজোরূপী সূর্যের একটি রথ আছে, যা পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিক্রমণ করে। সূর্যের রশ্মিসমূহকেই উপমা হিসাবে সূর্যের অশ্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কূর্মপুরাণে সূর্যের সপ্তরশ্মিকে সপ্ত তুরগ বা অশ্ব হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানে সূর্যরশ্মি বিশ্লেষণ করে সাতটি রং দেখা গেছে। এই সপ্তবর্ণকে সংক্ষেপে VIBGYOR বলা হয়। আচার্য সায়নের মতে, রথ অর্থে আদিত্যমণ্ডল বা সংবৎসর। বৎসর সাপেক্ষে সপ্ত অশ্ব অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিবস, রাত্রি ও মুহূর্ত। সূর্যের রথচক্রের দ্বাদশটি নেমি বা শলাকা। দ্বাদশ নেমি অবশ্যই দ্বাদশ মাস।

সূর্যোপাসনা পৃথিবীর নানা দেশে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন আকারে প্রচলিত ছিল। ভারতে সূর্যের উপাসকরা সৌর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রাচীন বঙ্গদেশে সেনবংশীয় রাজাগণ নিজেদের পরমসৌর বলে পরিচয় দিয়েছেন। সূর্যের মূর্তিপূজা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। উত্তরকালে সূর্যবিগ্রহ পূজার প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছে।

প্রাচীন সূর্যোপাসনা হ্রাস পেলেও সূর্যের অনুষঙ্গ নিয়ে সত্যস্বরূপ রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ জীবন ও বাণীর স্বপ্রকাশ নতুন যুগের সূচনা করেছে। সেই নতুন যুগের ভোরে ব্যক্তি ও সমাজের জড়তা, সঙ্কীর্ণতা ও সংশয়ের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে ত্যাগ, সেবা ও সংঘশক্তির উন্মেষ অনাগতকালের আরব্ধ কর্মকে সম্পন্ন করবে। সমৃদ্ধি, শান্তি ও মৈত্রীর ঈপ্সিত লক্ষ্যে ভারতীয় তথা বিশ্বের মানবসমাজকে পৌঁছে দেবে। পৃথিবীর মানুষের চোখে দেবত্বের স্বপ্নকে লগ্ন করে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করবে।

স্বনামধন্য শিল্পী সুনীল পাল 'উদ্বোধন' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদে সেই পুণ্য আবির্ভাবকে উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সত্যসূর্যের দুই পাশে মূর্তিমান ত্যাগ ও সেবা যেন মানুষের জীবনের জড়তা, সঙ্কীর্ণতা ও সংশয়ের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করতে সদা জাগ্রত প্রহরীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সংঘশক্তি সারথির ভূমিকায় আমাদের জীবন-রথের সপ্ত অশ্ব তথা প্রতিটি বৎসরকে পরমের দিকে পরিচালিত করছে। আকাশের সর্বত্র স্নিগ্ধ অরুণিমা ছড়িয়ে পড়েছে যা আমাদের জীবনে আনন্দময়তার আশ্বাস বহন করে আনছে। শিল্পী মেঘের বর্ণ সবুজ করেছেন। মেঘ পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে তাকে শস্যশ্যামল করে। সবুজ মেঘ যেন সেই নবীন প্রাণের উদ্দীপনাপূর্ণ আশ্বাসের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার ভেঙে চির জ্যোতির্ময় আবির্ভূত হয়েছেন। 'উদ্বোধন'-পরিবার সাদরে ও আনত শিরে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছে, প্রণতি নিবেদন করছে।—**সম্পাদক**